মুখবন্ধ

ফোকলোর একটি সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া ও যার মধ্য দিয়ে মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে লোর বা জ্ঞান তৈরি ও চর্চা করে। যে কোন সাংস্কৃতিক চর্চা ব্যক্তি সামাজিক জীবনের অংশ হিসেবে অর্জন করে, ও শিখতে পায়। বহুমুখী বিদ্যা শৃঙ্খলা' (A multi academic disciplinary)। ফোকলোরের শিক্ষাগত শৃঙ্খলা ও বিষয় পরিধি বিশ্লেষণ করলেও ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, নন্দনতত্ত্ব, জাদুঘরতত্ত্ব, পর্যটনবিদ্যা এবং অডিও-ভিজ্যুয়ালসহ বিভিন্ন জ্ঞাতিবিদ্যার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া গোত্র, সম্প্রদায় ও জাতিসত্ত্বার বিভাজন রেখার ভেতর বিবর্তিত ও বিকশিত প্রত্যেক জাতি ও সভ্যতার নিয়ামক শক্তি এই ফোকলোর। ফলে যেকোনো জাতির আত্মপরিচয়, অতীত ঐতিহ্য, প্রকৃতি ও মনোভঙ্গি বিশ্লেষণের বিকল্প নেই।

উল্লেখ্য যে, ফোকলোর সামাজিক বিজ্ঞান জ্ঞানকান্ডের অন্তর্ভুক্ত। তাই সমাজ বিষয়ক যেকোন গবেষণার ক্ষেত্রে প্রয়োজন মানুষ সমাজ ও জীবনের বিভিন্ন বিষয়ের উপর গভীর চর্চার।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের বিএসএস(সম্মান), পার্ট-৩ এর পাঠক্রমের অংশ হিসেবে ফোকলোর বিষয়ক যেকোনো একটি বিষয়ের উপর গবেষণাপত্র রচনা করতে হয়। এরই বাস্তবতায় রাজশাহী অঞ্চলে পার্ট-৩ এর গবেষণা কার্য পরিচালিত হয় এবং গবেষককে **"ভারতের পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি সমীক্ষা"** শীর্ষক একটি গবেষণাপত্র প্রণয়নের অনুমতি দেয়া হয়।

এই গবেষণাপত্র প্রণয়নে গবেষক হিবেসে কার্য সম্পাদন করেছি আমি *আব্দুর রহমান আরজা* আমার গবেষণার মূল লক্ষ্য হিসেবে প্রাধান্য দিয়েছি নদীয়া জেলার লোকসংস্কৃতি এবং কর্তাভজা সম্প্রদায়। সঙ্গত কারণে এ গবেষণা কর্মে ভুল থাকা বাঞ্চনীয়। তবে গবেষণা কর্মটি বস্তুনিষ্ঠভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত ছিল। নানান সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও আমার এ গবেষণা কর্মটি নদীয়া জেলার লোকসংস্কৃতি এবং কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সমাজ-সংস্কৃতি ফুটিয়ে তুলতে পারলে এবং গবেষণাপত্রটি পরবর্তীতে কোনো গবেষকের গবেষণায় কিঞ্চিৎ পরিমানে সহায়তা করে থাকে তবে গবেষক হিসেবে গবেষণা কর্মটি সার্থক বলে মনে করব।

ভূমিকা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আবশ্যকীয় কোর্স- ক্ষেত্রসমীক্ষা। ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য এ বিভাগের শিক্ষার্থীরা তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করে থাকে। সেই ধারাবাহিকতায় ফোকলোর বিভাগের শিক্ষার্থী হিসেবে আমরা ২১ তম ব্যাচ এবং ২০ তম ব্যাচের যথাক্রমে তৃতীয় এবং চতুর্থ বর্ষের ক্ষেত্রসমীক্ষার স্থান নির্বাচন হয়েছিল ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী স্থানে। ০৭ ই ডিসেম্বর থেকে ১৬ ই ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ১০ দিন হয়েছে এবারের ক্ষেত্রসমীক্ষা।

ক্ষেত্রসমীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গ তথা নদীয়া জেলার লোকসংস্কৃতি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়াও কর্তাভজা সম্প্রদায় সম্পর্কে বিস্তারিত বিষয়াদি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কলকাতা শহর এবং বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ভ্রমণ পূর্বক অভিজ্ঞতা সংযোজন করা হয়েছে এই ক্ষেত্রসমীক্ষায়।

স্থান নির্বাচন : পশ্চিমবঙ্গ (ভারত)।

তত্ত্বাবধায়ক : প্রফেসর ড. মোবার্‌রা সিদ্দিকা
প্রফেসর ড. রওশন জাহিদ

পূর্ব প্রস্তুতি :

বিদেশে ক্ষেত্রসমীক্ষা হওয়ায় পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে নিয়মানুযায়ী পাসপোর্ট এবং ভিসা করতে হয়েছে।

দিনলিপি

প্রথম দিন

আজ ক্ষেত্র সমীক্ষার প্রথম দিন। সকাল ৬:৪০ মিনিটের ট্রেনে সাগরদাঁড়ি এক্সপ্রেস ট্রেনে আমাদের যাত্রা শুরু হয়। গন্তব্য যশোর স্টেশন। সকালের স্নিগ্ধ হাওয়া গায়ে মাখিয়ে ঝিকঝাক ট্রেনের শব্দে আমরা এগিয়ে চললাম। সকালের নাস্তা আমরা ট্রেনেই করি। সকালের নাস্তায় ছিল খিচুড়ি ও ডিম।

সকাল ১১ঃ৩০ এ আমরা যশোর রেল স্টেশনে পৌঁছে যাই। তারপর সেখান থেকে পূর্ব নির্ধারিত বাসে করে আমরা বেনাপোলের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। বেনাপোলে পৌঁছে আমরা সবাই মিলে বাংলাদেশ সীমান্তের ইমিগ্রেশন কার্যক্রমের জন্য ইমিগ্রেশন অফিসে প্রবেশ করি এবং ইমিগ্রেশন কার্যক্রম শেষ করি। তারপর ভারত সীমান্তের ইমিগ্রেশন এর জন্য আমরা সবাই লাইনে দাঁড়াই। কিন্তু লাইনে এত পরিমান মানুষ ছিল যে প্রায় চার ঘন্টা লাইনে দাঁড়ানোর পর আমরা ভারতে ইমিগ্রেশন অফিসে প্রবেশ করি এবং ইমিগ্রেশন কার্যক্রম সম্পূর্ণ করি।

প্রায় রাত ৯ টার পর আমরা ভারতের পেট্রাপোল সীমান্ত থেকে বাস নিয়ে নদীয়া জেলার কল্যাণীর কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হই। আড়াই ঘন্টা বাস ভ্রমণের পরে আমরা আমাদের গন্তব্য কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় পৌঁছে গেলাম। আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের কল্যাণে আমাদের থাকার জায়গা হয় Dr B C Roy International guest house -এ। ক্ষেত্র সমীক্ষার প্রটোর সময় আমাদের এখানে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। রাতে খাওয়া-দাওয়া করে আমরা আমাদের নির্দিষ্ট রুমে যাই এবং একরাশ ক্লান্তি সঙ্গে করে ঘুম দেই।

দ্বিতীয় দিন

প্রথমদিনের প্রায় আঠারো ঘন্টা জার্নিতে ক্লান্তিতে আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তি প্রায় ফুরিয়ে গিয়েছিলো বলা চলে। আজকে ঘুম থেকে উঠতে প্রায় ভারতীয় সময় সকাল ১০ টা বেজে যায়। ১০.৩০ এ সকালের খাবার খেলাম। সকালের খাবারে ছিল লুচি এবং সবজি। ভারতীয় খাবার আমাদের বাংলাদেশের তুলনায় একটু ভিন্ন। এখানে তরকারিতে ঝাল, লবন কম দেয়া হয়।

নাস্তা শেষে ১১ টায় আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ.পি.জে আব্দুল কালাম অডিটোরিয়ামে গেলাম এবং ফোকলোর বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত কর্মশালায় যোগদান করি। কর্মশালার শিরোনাম ছিল Folklore and Tribal Lore Studies in India and Bangladesh Perspective and Present Status.

বেলা ১১.৩০ মিনিটে ভ্রমর কইয়ো গিয়া উদ্বোধনী সংগীত দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। ১১.৩৫ মিনিটে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অতিথি বরণ করা হয়। ১১.৫০ এ কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়য়ের উপাচার্য বক্তব্য প্রদান করেন। তারপর যথাক্রমে বক্তব্য প্রদান করেন অনুষ্ঠান সভাপতি নিবন্ধক প্রফেসর ড. দেবাংশু রায়, কলা ও বাণিজ্য অধ্যক্ষ প্রফেসর অবনিন্দ কুমার ভূঁইয়া, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রফেসর ড. জাহাঙ্গীর হোসেন, প্রফেসর ড. মোবার্‌রা সিদ্দিকা, প্রফেসর ড. আবুল হাসান চৌধুরী এবং প্রফেসর ড. রওশন জাহিদ। উপস্থিত বক্তারা সকলেই ফোকলোরের সাথে মানব সমাজের নিবিড় সম্পর্কের বিষয়ে আলোকপাত করেন। এছাড়াও দুই বাংলার সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন এবং পার্থক্য তুলে ধরেন সম্মানিত অতিথিবৃন্দ। সর্বশেষ কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের প্রফেসর ড. কাকলী ধারা মন্ডল মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন।

দুপুর খাওয়া বিরতির পর আমরা অনুষ্ঠানের দ্বিতীয়াংশে অংশগ্রহণ করি। দ্বিতীয়াংশে সাংস্কৃতির অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পশ্চিম বাংলার সংস্কৃতি তুলে ধরে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের শিক্ষার্থীরা।

অনুষ্ঠান শেষে আমরা শিক্ষকদের অনুমতিক্রমে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় পরিভ্রমণে বের হই। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌন্দর্যে এবং আতিথ্যতায় মুগ্ধ হয়ে আমরা Dr B C Roy International guest house -এ ফিরে যাই এবং দ্বিতীয় দিনের ক্ষেত্রসমীক্ষার ইতি টানি।

তৃতীয় দিন

আজ ৯-ই ডিসেম্বর ২০২২ ইংরেজি, রোজ শুক্রবার। আজ আমাদের ক্ষেত্রসমীক্ষার তৃতীয় দিন। পূর্ব নির্ধারিত কল্যাণী ঘোষপাড়া এলাকায় অবস্থিত সতীমায়ের মন্দির প্রদর্শন এবং কর্তাভজা সম্প্রদায় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সকাল সাতটায় স্যার ম্যামদের সাথে আমরা রওনা হই। উক্ত স্থানে যেয়ে সতীমাতা সম্পর্কে জ্ঞানর্জন করি। সতীমাতার বাল্যকালে নাম ছিল স্বরসতী। তথ্যদাতার তথ্য অনুযায়ী জানতে পারি সতীমাতা একসাথে বেশকিছু রূপে বিরাজমান। কেউ তাকে দূর্গা ডাকেন কেউবা কালী। সতীমাতার মাতার মন্দিরকে কেন্দ্র করে

প্রতিবছরন ১৫ দিন মেলার আয়োজন করা হয়। যদিও একসময় মেলার সময়সীমা একমাস ছিল। উক্ত মেলায় দেশ-বিদেশের নানা ভক্তের আবির্ভাব ঘটে। প্রচলিত আছে, মন্দিরের সামনের পুকুরে গোসল করে মন্দিরে মানত করতে মনের বাসনা পূর্ণ হয়। আমি ঘোষপাড়া এলাকায় তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যেয়ে রতন সরকার নামে একজনকে পাই, যিনি একসময় বোবা থাকলেও সতীমাতার মন্দিরে মানত করার পর আরোগ্য লাভ করে।

ঘোষপাড়া থেকে ফায়ার নাস্তা করে আমরা কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাসাগর অডিটোরিয়ামে যাই এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের শিক্ষকদের আয়োজিত লেকচার এবং প্রামাণ্যচিত্র উপভোগ করি।

দুপুরে খাবার পর গাড়ি যোগে বুদ্ধদেব পল্লীতে মৃৎশিল্প প্রদর্শন করি। তারপর রথতলাতে শ্রীকৃষ্ণরায় মন্দির প্রদর্শন করি। মন্দির প্রদর্শন শেষে হুগলিতে জাফরখাঁ গাজীর দরগা প্রদর্শন করি। গাজীর দরগায় ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের আরাধনা চলে। তারপর আমরা হংসেশ্বরী মন্দিরে যাই। প্রাচীন এই মন্দির এখনো হিন্দু ধর্মালম্বীদের কাছে যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে চলেছে। সর্বশেষ ৫.৪০ মিনিটে ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে ৬ টায় পৌঁছে যাই এবং তৃতীয় দিনের ক্ষেত্রসমীক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটে।

চতুর্থ দিন

স্বপ্ন ছিল শান্তিনিকেতন দেখার। ভারতবর্ষে ক্ষেত্রসমীক্ষা হওয়ায় স্বপ্নটা বাস্তব হওয়ার স্বপ্ন উঁকি দিচ্ছিলো। শেষ পর্যন্ত স্বপ্নটা সত্যি পরিণত হলো। আজ আমাদের গন্তব্য বিখ্যাত শান্তিনিকেতন। ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিভৃতে ঈশ্বরচিন্তা ও ধর্মালোচনার উদ্দেশ্যে বোলপুর শহরের উত্তর-পশ্চিমাংশে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।

সকালে নির্দিষ্ট বাসে করে আমরা শান্তিনিকেতনের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। দীর্ঘ ছয় ঘন্টা ভ্রমণ শেষে শান্তিনিকেতনে পৌঁছলাম। সেখানে আমাদের সম্মানিত শিক্ষকমন্ডলী আমাদের সুবিধার্তে একজন গাইড নিলেন। গাইড আমাদেরকে শান্তিনিকেতন সম্পর্কে বিস্তারিত বললেন এবং ঘুরে ঘুরে দেখালেন।

শান্তিনিকেতন : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম রায়পুরে আসেন তারপর রায়পুরের ভুবন ডাঙ্গার জমিদার ভুবন মোহন সিংহের কাছে থেকে ভুবন ডাঙ্গার জায়গাটি মাত্র ১ টাকায় কিনে নেন।

১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সর্বপ্রথম এই ভুবন ডাঙ্গা একটি আবাস গৃহ তৈরি করেন। তখন রবি ঠাকুরের বয়স ছিল ১২ বছর।

১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আরও কুড়ি একর জমি এবং সাথে দুটি ছাতিম গাছ বাৎসরিক ৫ টাকার বিনিময় কিনে নেন। তারপর তিনি ওখানে একটি অতিথিশালা তৈরি করেন, এবং অতিথিশালাটির নাম দেন শান্তিনিকেতন। উনি এখানে একটি আশ্রম ও তৈরি করেন। পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এখানে পাঠভবন তৈরি করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৈরি শান্তিনিকেতন অতিথি সলাটির নাম অনুযায়ী ধীরে ধীরে সমগ্র ভুবন ডাঙার নাম শান্তিনিকেতন হয়ে যায়।

শান্তিনিকেতনে অবস্থিত বিশ্ব ভারতী মিউজিয়াম প্রদর্শন শেষে আমরা দুপুরের খাবার খেয়ে শান্তিপুরের পাশে বিখ্যাত সোনাঝুরি হাটে গেলাম। বিখ্যাত বিরাট হাটে এমন কিছু নাই যা পাওয়া যায়না। দেশ বিদেশ থেকে অনেক মানুষ হাটে আসে। এখানের পণ্যের মূল্য তুলনামূলক অনেক কম।

সোনাঝুরি হাট প্রদর্শন শেষে বাস যোগে Dr B C Roy International guest house -এ ফিরে গেলাম এবং চতুর্থ দিনের কার্যক্রমের পরিসমাপ্তি ঘটলো।

পঞ্চম দিন

আজ ক্ষেত্রসমীক্ষার পঞ্চম দিন। সকাল সাতটায় Dr B C Roy International guest house থেকে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ি। আজকে শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমন্ডলী আমাদের গ্রুপ করে দেন। আমাদের গ্রুপে ছিলাম ১০ জন। তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম আমরা কল্যাণী ঘোষপাড়া সতীমাতা মন্দির এলাকায় গেলাম এবং তথ্য সংগ্রহ করলাম।

সতীমাতা মন্দির প্রান্তরে অবস্থিত স্কুলে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গেলে স্কুল প্রধান আমাদের সাদর অভিবাদন জানান। স্কুলের নাম সতীমাতা আদর্শ বিদ্যাপীঠ। ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত স্কুলটি মন্দির প্রান্তরে হওয়ায় স্কুলের নিয়ম মেনে চলতে হয় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের। যেমন : স্কুলের কোনো শিক্ষার্থী টিফিনে আমিষ জাতীয় কোনো খাবার আনতে পারে না।

তারপর আমরা তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ঘোষপাড়া পার্শবর্তী এলাকা ইসলামপুরে গেলাম। সেখানে বেশকিছু বাড়ি থেকে লোক সংস্কৃতি বিষয়ক নানান তথ্য সংগ্রহ করি। যেমন : ধাঁধা, প্রবাদ, কীর্তন ইত্যাদি।

আজকে সন্তোষজনক তথ্য সংগ্রহ করতে পারায় মন বেশ ফুরফুরে হয়ে যায়। মনে একরাশ আনন্দ নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে গেলাম। সন্ধ্যা পর বন্ধুরা ঘোষপাড়ায় অনুষ্ঠিত বইমেলায় ঘুরতে গেলাম। বইমেলা থেকে আমি দুটো বই কিনলাম এবং নদীয়ার কিছু আঞ্চলিক খাবার খেলাম। তারপর রাত ৮ টায় ক্যাম্পে ফিরে গেলাম এবং ক্ষেত্রসমীক্ষার পঞ্চম দিনের কার্যক্রম সমাপ্ত করলাম।

ষষ্ঠ দিন

আজকে ১২-ই ডিসেম্বর, ২০২২ ইংরেজি। আজ আমাদের ক্ষেত্রসমীক্ষার ষষ্ঠ দিন। দিনের শুরুতে আমরা কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে অবস্থিত বিদ্যাসাগর সভাকক্ষে গেলাম। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষকমন্ডলী কর্তৃক সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত সেমিনারে স্পিকার হিসেবে ছিলেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সম্মানিত শিক্ষক প্রফেসর ড. সুমিত মুখার্জি।

ড. সুমিত মুখার্জি পশ্চিমবঙ্গের নানান লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলাপন তুলে ধরেন। বিশেষ করে ছৌ নৃত্য এবং সতীমায়ের মন্দির সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচলা আমার খুবই ভালো লাগে। ঐতিহ্যগত প্রাচীন ছৌ নৃত্য সম্পর্কে ভিডিও ডকুমেন্টরি আমাদের জন্য বেশ শিক্ষণীয় ছিল। কারণ পাঠক্রমে আমরা ছৌ নৃত্য পড়লেও কালের বিবর্তনে তা হারিয়ে যাওয়ায় তার আঙ্গিক দেখার সুযোগ হয়নি। ড. সুমিত মুখার্জির ছৌ নৃত্য সম্পর্কে ভিডিও ডকুমেন্টারিতে আমরা স্পষ্ট রূপে দেখার এবং বোঝার সুযোগ পাই। এছাড়াও সতীমাতার মন্দির এবং মন্দিরকেন্দ্রিক দোল মেলা সম্পর্কে ভিডিও ডকুমেন্টারির মাধ্যমে লোকধর্ম বিষয়ে নানান বিষয় জানতে পারি। বিশেষ করে মন্দিরের পুকুরে গোসল করে দন্ডি কেটে মানত করার ভিডিও এবং লেকচার আমাকে মুগ্ধ করে। ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে দন্ডি কাটা বিষয়ে শুনলেও ঠিক কল্পনা করতে পারছিলাম না বিষয়টি। ড. সুমিত মুখার্জির সেমিনারের পর বিষয়টি এখন আমার কাছে পরিষ্কার।

তারপর আমাদের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। মনোমুগ্ধকর অনুষ্ঠানের পর আমরা বন্ধুরা মিলে কাঁচড়াপাড়ায় গেলাম। কাঁচড়াপাড়া তুলনামূলক সুন্দর এবং গোছালো জায়গা। কিছু বাজার করে আমরা ক্যাম্পে ফিরে গেলাম এবং ষষ্ঠদিনের ক্ষেত্রসমীক্ষার সমাপ্ত করলাম।

সপ্তম দিন

আজকে ক্ষেত্রসমীক্ষার সপ্তম দিন। আজ মূলত ভ্রমণ দিবস ছিল। স্থান : কলকাতা।

দিনের শুরুতে সম্মানিত শিক্ষকমন্ডলীর তত্ত্বাবধানে আমরা কল্যাণী ঘোষপাড়া স্টেশনে টিকিট কেটে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। ঝিকঝাক ট্রেনের ছুটে চলায় মুগ্ধতা কমিয়ে দিয়েছিল ট্রেনের ভেতরের ভীড়। তুলনামূলক ভারতের ট্রেনে ভীড় বেশি থাকে। প্রায় দুই ঘন্টা পর আমরা কলকাতার শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছলাম। শিয়ালদহ স্টেশন থেকে সবাই কয়েকজন করে গ্রুপ করে ভাগ হয়ে গেলাম।

আমরা ৭ জন গ্রুপ হয়ে কলকাতা নিউমার্কেট গেলাম। নিউ মার্কেট, পূর্বে স্যার স্টুয়ার্ট হগ মার্কেট নামে পরিচিত, কলকাতার একটি বাজার যা ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের (মির্জা গালিব স্ট্রিট/রানি রাসমনি সড়ক) পাশে লিন্ডসে স্ট্রিটে অবস্থিত। প্রাথমিকভাবে "নিউ মার্কেট" মূল ঘেরা বাজারকে নির্দেশ করলেও বর্তমানে স্থানীয় ভাষায় পুরো শপিং এলাকাটিকে প্রায়ই "নিউ মার্কেট" বলে ডাকা হয়। যদিও নিউমার্কেট সকাল ১১ টার আগে তেমন খোলে না বললেই চলে। নিউমার্কেট যেয়ে প্রথমে আমরা সকালের নাস্তা করলাম। তারপর আমরা নিউমার্কেটে বাজার করার উদ্দেশ্যে ঢুকে পড়লাম।

নিউমার্কেটে হরেক পদের চকলেট পাওয়া যায়। আমরা প্রত্যেকে কিছু কিছু চকলেট কিনলাম। আমি বাসার জন্য এক প্যাকেট চকলেট নিলাম। তারপর কাপড় কেনার জন্য মার্কেটের ভেতরে যেয়ে আমাদের চক্ষু চড়কগাছে ! এখানে প্রতিটা জিনিসের মূল্য তিন থেকে দশগুন পর্যন্ত। দামাদামি না করলে এখানে বড় ব্যবধানে ঠগতে হবে। দামাদামি বিষয়ে পটু না হওয়ায় নিউমার্কেটে শুধু চকলেট কিনলাম।

তারপর ট্রেন ধরে কাঁচড়াপাড়া বাজারে যেয়ে প্রয়োজনীয় বাজার করে Dr B C Roy International guest house -এ ফিরে গেলাম এবং এর মাধ্যমে আজকের দিনের পরিসমাপ্তি ঘটলো।

অষ্টম দিন

আজ ১৪-ই ডিসেম্বর ২০২২ ইংরেজি। আমাদের ক্ষেত্রসমীক্ষার অষ্টমদিন। আজ আমাদের গন্তব্য শ্রীরামপুর কলেজ।

সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমে ট্রেনযোগে ব্যারাকপুর তারপর সিএনজি এবং শেষে হুগলি নদীর উপর দিয়ে ফেরিযোগে নদী পার হয়ে নদী তীরে অবস্থিত শ্রীরামপুর কলেজে পৌঁছলাম। শ্রীরামপুর কলেজ ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান। ১৮১৮ সালে উইলিয়ম কেরী, জোশুয়া মার্শম্যান ও উইলিয়ম ওয়ার্ড নামে তিনজন মিশনারি দেশীয় পুরোহিত সম্প্রদায় সৃষ্টির মানসে ভারতীয় খ্রিস্টানদের প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে এই কলেজ নির্মাণ করেন। কলেজে পৌঁছে হালকা নাস্তা করলাম। তারপর পূর্ব নির্ধারিত অনুষ্ঠানে যোগদান করলাম।

অনুষ্ঠানে আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমন্ডলী লোকসংস্কৃতির নানান দিক আলোচনা করেন। আলোচনা যদিও সচারচর পছন্দের না, তবু শিক্ষকদের চমৎকার উপস্থাপনায় মুগ্ধ না হয়ে উপায় নাই। আলোচনা শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর্ব শুরু হলো। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক শ্রীরামপুর কলেজের বাংলা বিভাগের শিক্ষক ড. ভাস্কর চৌধুরী এবং তার স্ত্রী শিক্ষিকা মিঠু মিলে যে চমৎকার অনুষ্ঠান আমাদের উপহার দিলেন তার স্মৃতি নিশ্চয় দীর্ঘদিন বয়ে বেড়াবো।

শ্রীরামপুর কলেজ : বাংলার দ্বিতীয় উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শ্রীরামপুর কলেজ। কলকাতায় যে বছর হিন্দু কলেজ (বর্তমানে প্রেসিডেন্সি) প্রতিষ্ঠিত হয় ঠিক তার পরের বছর হুগলি জেলার শ্রীরামপুর শহরে প্রতিষ্ঠিত হয় এই কলেজ। বাংলা তথা ভারতের তো বটেই এশিয়ার প্রথম মিশনারি কলেজও এটি। এই প্রতিষ্ঠানের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে রয়েছে ইতিহাসের নানা উপকরণ। রয়েছে দ্বি-শতবর্ষের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির অজস্র কথোপকথন।
আঠেরো শতকের মাঝামাঝি দিনেমারদের হাতে শ্রীরামপুর হয়ে ওঠে বাণিজ্য-নগরী। শিক্ষার প্রসার ঘটে 'শ্রীরামপুর ত্রয়ী' অর্থাৎ কেরি-মার্শম্যান-ওয়ার্ড এই শহরে আসার পরে। তখন ১৮০০ সাল। তাঁদের হাত ধরে ১৮১৮ সালে গঙ্গার ধারে 'অল্ডিন হাউজে' চালু হয় শ্রীরামপুর কলেজ। ডেনমার্ক সরকারের দেওয়া প্রায় ১০ একর জমিতে বর্তমান কলেজ ভবনে পড়াশোনা শুরু হয় ১৮২১ সালে।

১৮২৭ সালে ডেনমার্কের রাজা ষষ্ঠ ফ্রেডরিকের দেওয়া সনদবলে এই প্রতিষ্ঠান ধর্মতত্ত্বের বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা পায়। কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন কেরি। ১৮৩৩ সালে কলেজের সংবিধান চালু হয়। কলেজ কাউন্সিলের প্রথম মাস্টার হন কেরি। তখন অধ্যক্ষ পদে বসেন মার্শম্যান।

শ্রীরামপুর কলেজ ভ্রমণ শেষে আমরা ব্যারাকপুর ফিরে গেলাম এবং ব্যারাকপুর থেকে ট্রেনযোগে কল্যাণী ঘোষপাড়ায় অবস্থিত আমাদের ক্যাম্পে ফিরে গেলাম। এর মাধ্যমে আমাদের ক্ষেত্রসমীক্ষার অষ্টমদিনের কার্যক্রম সমাপ্ত হলো।

নবম দিন

আজ ক্ষেত্রসমীক্ষার নবম দিন। আজ আমাদের ঘুরা ফিরার দিন। অর্থাৎ আজ সবাই পছন্দ মত জায়গায় নিজেদের মত করে ঘুরতে পারে আজকের দিনে।

আমরা ৭ জন একসাথে ঘুরার সিদ্ধান্ত নিলাম। সকাল ৯ টার ট্রেনে চেপে দমদম স্টেশনের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। দমদম স্টেশনে নেমে মেট্রো রেলে চেপে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। এটা ছিল আমার জীবনের প্রথম মেট্রোরেল ভ্রমণ। কলকাতার মেট্রোরেল মাটির নিচ দিয়ে চলে। কলকাতায় নেমে আমরা ভিক্টরিয়া মেমোরিয়াল দেখার উদ্দেশ্যে গেলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আজ ভিক্টরিয়া বন্ধ থাকায় ভেতরে প্রবেশ করতে পারিনি।

ভিক্টরিয়ার সামনে ছবি তুলে কলকাতা জাদুঘর প্রদর্শন করতে গেলাম। টিকেট কেটে ভেতরে প্রবেশ করে প্রায় তিন ঘন্টা সময় ব্যয় করলাম সেখানেই। কি নেই সেখানে! ডাইনোসরের কঙ্কাল থেকে শুরু করে মানুষের মমি পর্যন্ত আছে এই জাদুঘরে। এত বড় জাদুঘর, পুরোপুরি শেষ করতে বেশ কয়েকঘন্টা লাগারই কথা। জাদুঘর প্রদর্শন শেষে আমরা কলেজ স্ট্রিট এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভ্রমণ করলাম।

হিন্দু স্কুল, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় এবং শেষে সেই বিখ্যাত কফি হাউস। কফি হাউসে আমরা যেয়ে কফি খেলাম। এই কফি হাউসের স্মরণে মান্না দে বিখ্যাত গান রচনা করেছিলেন। " কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আজ নাই!"

কফি হাউস ভ্রমণ শেষে আমরা শিয়ালদহ স্টেশনের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। সেখান থেকে ট্রেনে চেপে সরাসরি কল্যাণী ঘোষপাড়া স্টেশনে নামলাম এবং আমাদের ক্যাম্পে ফিরে গেলাম। এর মাধ্যমে আমাদের ভ্রমণ শেষ হলো এবং ভারতবর্ষে ক্ষেত্রসমীক্ষার ইতি ঘটলো।

দশম দিন

আজ আমাদের ক্ষেত্রসমীক্ষার শেষ দিন। ভারতবর্ষে এসে প্রথমে খুব একটা ভালো না লাগলেও, শেষ দুইদিনে কেমন যেন একটা ভালো লাগা কাজ করছিল। মনে হচ্ছিল, আর ক'টা দিন থেকে যাই। এখানের আকাশ বাতাস সব নিজের মনে হচ্ছিল।

সকালে ঘুম থেকে উঠে সবাই ব্যাগ গুছিয়ে রুম পরিষ্কার করে বাসে উঠলাম। গন্তব্য আমাদের দেশমাতৃকা বাংলাদেশ। যেন মায়ের কোলে ফিরে যাচ্ছি। বাস এগিয়ে চলছে, আর ভেতরে আনন্দ কাজ করছে। সেই আনন্দ সঙ্গ করে পেট্রোপোল সীমান্তে পৌঁছে ভারত সীমান্তের কার্যক্রম সম্পন্ন করে দেশের মাটিতে প্রবেশ করলাম। দেশের আকাশ, দেশের বাতাস! একটা অন্য রকম ভালোবাসা থাকে দেশের প্রতি, যেটা বিদেশ না গেলে ঠিক বোঝা যায়না।

দেশের বেনাপোল বন্দরের কার্যক্রম শেষ করে খাওয়াদাওয়া করে আমরা বাসে চেপে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। বাস এগিয়ে চলছে আর মনের ভেতর দেশে ফেরার আনন্দ বয়ে চলেছে। যদিও পিছুটানে নদীয়া, কলকাতার মায়া কাজ করছে তবু এই আনন্দের কাছে সেটা ভীষণ নগন্য। আমি দেশের মাটির গন্ধ অনুভব করতে পারছি।

পাঁচ ঘন্টা জার্নি শেষে আমারা রাজশাহী পৌঁছলাম। আমি কাজলা গেটে নেমে গেলাম এবং আমার মেস তালাইমারীর উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। এভাবেই আমাদের দশ দিনের ক্ষেত্রসমীক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটলো।

জেলা পরিচিতি

নদীয়া

নদীয়া পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীনতম জেলাগুলির মধ্যে একটি এবং প্রাচীন সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্র। নদীয়া রাজ্যের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কৃষ্ণনগর এই জেলার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী শহর। এই জেলার আয়ের প্রধান উৎস কৃষি। কৃষি ছাড়াও পর্যটন খাত থেকেও এই জেলার প্রধান আয় এসে থাকে।

নদীয়া জেলার ভৌগলিক সীমানা পূর্বে বাংলাদেশ, পশ্চিমে বর্ধমান ও হুগলি জেলা, উত্তর ও উত্তর পশ্চিমে মুর্শিদাবাদ জেলা এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব দিকে উত্তর চব্বিশ পরগনা নিয়ে গঠিত।

প্রতিষ্ঠাকাল : নদীয়া জেলা প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯৪৭ সালে।
আয়তন : ৩৯২৭ বর্গ কিলোমিটার।
জেলা সদর : কৃষ্ণনগর।

নদীয়া শ্রীচৈতন্যদেবের পবিত্র আবির্ভাব ভূমি এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম পুরাকীত্তি সমৃদ্ধ জেলা । এখানকার পোড়ামাটির অলংকরণযুক্ত বন্ধ মন্দির এবং শিবনিবাসের বৃহদায়তন ও বিরল রীতির দেবালয়গুলি নদীয়ারাজের সংস্কৃতি পোষকতার উজ্জল নিদর্শন ।

নদীয়ায় পাল-সেনযুগের যাবতীয় মন্দির আজ কালত্রোতে লুপ্ত। সেজন্য এ গ্রন্থে সেগুলির বিবরণ দেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত ও রক্ষিত সে যুগের প্রস্তরমূতি প্রভৃতির বিস্তৃত বর্ণনা যথাস্থানে সঙন্গিবিষ্ট হয়েছে।

নদীয়ার ইতিহাস অত্যন্ত সমৃদ্ধ। নদীয়া প্রধানত হিন্দুদের তীর্থস্থান হিসেবেই খ্যাত। লোকমুখে কথিত আছে রাজা বল্লাল সেন এই জেলা প্রতিষ্ঠা করেছেন। নদীয়ার ইতিহাস থেকে জানা যায়, বাংলার হিন্দু রাজারা গৌড় এবং নদীয়াতে অবস্থান করতেন। বখতিয়ার খিলজী নদীয়ার দখল নেয়ার আগ পর্যন্ত নদীয়া ছিল বাংলার রাজধানী।

আমাদের ক্ষেত্রসমীক্ষার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে আমাদের অবস্থান ছিল কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় নদীয়া জেলার কল্যাণী মহকুমায় অবস্থিত।

কল্যাণী মহকুমা

কল্যাণী নদীয়া জেলার একটি প্রশাসনিক মহকুমা। মহকুমাটির মোট আয়তন ৫২৬.৫৭ বর্গ কিলোমিটার। এটি তিনটি থানা নিয়ে গঠিত। এই মহকুমার মোট জনসংখ্যার ২৩.২৭ শতাংশ মানুষ গ্রামীণ এলাকাতে এবং বাকি ৭৬.৭৩ শতাংশ মানুষ শহরে বাস করে।

বীরভূম

বীরভূম জেলা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বর্ধমান বিভাগ-এর অন্তর্গত একটি জেলা এবং জেলাটি ভৌগোলিক ভাবে রাঢ় অঞ্চলের অন্তর্গত। জেলাটির পূর্ব দিকে ভাগীরথী নদী প্রবাহিত হয় এবং এটি বীরভূমকে নদীয়া জেলা ও মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে বিছিন্ন করেছে।

১৭৮৭ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসনামলে বীরভূম জেলার জন্ম হওয়ার আগে এটা মুর্শিদাবাদ জেলার অংশ ছিল। সাঁওতাল বিদ্রোহের জন্য ইতিহাসের অনন্য পাতায় এ জেলার নাম লিখা আছে।

বীরভূম জেলার অর্থনীতি মূলত কৃষিভিত্তিক। জেলার মোট জনসংখ্যার ৭৫% কৃষি নির্ভর। এই জেলার প্রধান শিল্পগুলো হলো তুলা চাষ, রেশম চাষ, তাঁত, চালকল, লাক্ষা উৎপাদন, পাথর খনি, ধাতু শিল্প ও মৃৎশিল্প।

বীরভূম জেলার রামপুরহাট শহরের কাছে অবস্থিত তারাপীঠ একটি ক্ষুদ্র মন্দির নগরী। এটা হিন্দুদের কাছে একটি উল্লেখযোগ্য তীর্থক্ষেত্র। এছাড়াও পর্যটন জায়গা হিসেবে দুবরাজপুর শহরের কাছাকাছি মামা ভাগ্নে পাহাড় উল্লেখযোগ্য। এই পাহাড়ের ওপর পাহাড়েশ্বর শ্মশানকালীমন্দির ও কাছেই অবস্থিত হেতেমপুর রাজবাড়িকে কেন্দ্র করে বীরভূম গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছে।

হুগলি

হুগলি ভারত প্রজাতন্ত্রের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের বর্ধমান বিভাগের একটি জেলা। হুগলি জেলার নামকরণ করা হয়েছে এই জেলার অন্যতম প্রধান শহর হুগলির নামানুসারে। ১৭৯৫ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজরা প্রশাসনিক কারণে হুগলি জেলা তৈরি করেছিল। অর্থনীতি ও শিল্পে উন্নত হলেও জেলার ৫০ শতাংশ মানুষ কৃষির উপর নিরভারশীল।

বাণিজ্যিক কারণে হুগলীর আশপাশ জুড়ে বিদেশী বণিকদের অন্যতম বাণিজ্যিক কেন্দ্র পরিণত হয়েছিল। যেমন ১৭৫৫ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীরামপুর দিনেমার বণিকরা বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে তোলে। ১৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজ হুগলি বন্দরে ব্যবসা শুরু করে। ১৮১৬ খ্রিষ্টাব্দে চন্দননগরে ফরাসিদের বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে। ১৮২৫ খ্রিষ্টাব্দে ৭মে চুঁচুড়া ইংরেজদের দখলে চলে যায়। ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের ২রা মে চুঁচুড়া শহর আনুষ্ঠানিকভাবে ভারত সরকারের কর্তৃত্বাধীন আসে।

হুগলি জেলায় অনেক বিখ্যাত মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হাজি মুহাম্মদ মহসীন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কানাইলাল দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মতিলাল রায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

সুচিপত্র

ভারতবর্ষের লোকসংস্কৃতি (16-20)

লোকসংস্কৃতি

ভারতবর্ষের লোকসংস্কৃতি

প্রবাদ

লোকবিশ্বাস ও সংস্কার

ধাঁধা

কর্তাভজা সম্প্রদায় (21-28)

কর্তাভজা ধর্মের উৎপত্তি

সতী মায়ের মন্দির

কর্তাভজার মূল নীতি

বিয়ে ও যৌনজীবন সম্পর্কিত কিছু নিয়মনীতি

খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কিত কিছু নিয়মনীতি

মৃত্যু পরবর্তী সংস্কার

চিকিৎসাপদ্ধতি

কর্তাভজা সম্প্রদায়ে লোকচিকিৎসা

সতীমায়ের মন্দির কেন্দ্রিক বিশ্বাস ও সংস্কার

কলকাতা (28-30)

আলোকচিত্র

উপসংহার

ভারতবর্ষের লোকসংস্কৃতি

লোকসংস্কৃতি

লোক সংস্কৃতি হলো সাধারণ মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত তাদের চিন্তায় ও কর্মের ঐতিহ্যনুসারে বৃহত্তর গ্রামীণ জনগোষ্টীর ধর্মীয় ও সামাজিক বিশ্বাস, আচার-আচরণ ও অনুষ্ঠান, জীবন-যাপন প্রণালী, শিল্প ও বিনোদন ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা সংস্কৃতি। আরও সহজ ভাবে বললে লোক সংস্কৃতি হলো কোনো নিদির্ষ্ট এলাকায় বসবাস রত মানুষের মুখে মখে প্রচলিত সামাজিক বিশ্বাস , আচার, রীতি-নীতি ও তাদের সংস্কৃতি ও কৃষ্টিই হলো লোক সংস্কৃতি।

অধ্যাপক ড. তুষার চট্টোপাধ্যায় তাঁর "লোক সংস্কৃতির তত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান" গ্রন্থে "লোকসংস্কৃতির" সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন "লোকসংস্কৃতি লোকায়ত সংহত সমাজের সমষ্টিগত প্রয়াসের জীবনচর্যা ও মানসচর্চার সামগ্রিক কৃতি। "

লোকসংস্কৃতির উদাহরণ বলতে গেলে বলতে হয় লোকসংস্কৃতির মানুষের মুখে মুখে যে কৃষ্টি লালিত হয় সেগুলোই। যেমনঃ রীতি-নীতি, কথা, ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার- ব্যবহার, প্রথা, ইত্যাদি।

ভারতবর্ষের লোকসংস্কৃতি

রবীন্দ্রনাথ ১৩০২ বঙ্গাব্দে তাঁর 'গ্রাম্যসাহিত্য' প্রবন্ধে বলেছিলেন, 'কেবল সম্প্রতি অতি অল্পদিন হইল আধুনিক কাল, দূরদেশাগত নবীন জামাতার মতো নূতন চাল-চলন লইয়া পল্লীর অন্তঃপুরেও প্রবেশ করিয়াছে। গ্রামের মধ্যেও পরিবর্তনের হাত পড়িয়াছ '। প্রায় একশো বছর পেরিয়ে আজ উন্নত প্রযুক্তির কালেও বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতির সেই পরিবর্তনের মাত্রা বেড়েছে বই কমেনি। অতএব এই বিবর্তনের ইতিহাস দীর্ঘদিনের। সংহত অঞ্চলের সংস্কৃতিই লোকসংস্কৃতি, যার ক্ষেত্রস্থল মূলত গ্রামাঞ্চলই। ভারতবর্ষের লোকসংস্কৃতির কথা যদি বলতে হয়, তাহলে অবস্থান ও ভৌগোলিক পরিবেশের সাপেক্ষেই তা বিচারযোগ্য। লোকায়ত ভারতবর্ষ, কৃষিভিত্তিক সামন্ততান্ত্রিক গ্রামই তো ভারতবর্ষের প্রকৃত স্বরূপ।

পুরো ভারতবর্ষে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অগণিত লোকসংস্কৃতি উপাদান। এখানের মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপনের মধ্যে প্রতীয়মান হয় লোকসংস্কৃতি। যদিও আধুনিকতার ছোঁয়ায় লোকসংস্কৃতির উপাদান গুলো অতীতের তুলনায় অনেকাংশেই লোপ পেয়েছে, তবুও তুলনামূলক ভারতবর্ষে অধিক লোক সংস্কৃতির উপাদানের দেখা মেলে।

ভারতবর্ষে ক্ষেত্র সমীক্ষায় যেসব লোকসংস্কৃতির উপাদানের দেখা পেয়েছি তা ধারাবাহিকভাবে নিম্নে বর্ণিত হলো :

প্রবাদ

'প্র' মানে 'বিশিষ্ট' এবং 'বাদ' বা 'বচন' মানে কথা অর্থাৎ বিশিষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ কথা, সুতরাং প্রবাদ হলো লোক পরম্পরাগত বিশেষ উক্তি বা কথন। দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতালব্ধ কোনো গভীর জীবনসত্য, লোকপ্রিয় কোনো সংক্ষিপ্ত উক্তির মধ্যে সংহত হয়ে প্রকাশিত হলে তাকে প্রবাদ-প্রবচন বলে। জীবন, জগৎ ও সমাজ সম্পর্কে মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত এই প্রবাদ লোকসাহিত্যের একটি বিশেষ শাখা।

সংগৃহীত প্রবাদগুলোকে কয়েকটি ধাপে ভাগ করা হলো :

পরকীয়া প্রেম বিষয়ক প্রবাদ:

বৈষ্ণব সাহিত্যে পরকীয়া প্রেম কখনও কখনও সমর্থন করা হয়েছে। কিন্তু বাঙালির প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় পরকীয়া প্রেমকে কখনই সমর্থন করা হয়নি। তাইতো পরকীয়া প্রেম সম্পর্কে সাবধান বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে বিভিন্ন প্রবাদে।

১. ঘরের কথা বলতি নেই,
নাঙ মরলে কাঁদতি নেই।

২. নাঙের বাড়ির গল্প,
করলি করিস অল্প।

৩.কনে যাচ্ছে নাচতি নাচতি,

নাঙের বাড়ি তামাক বাচতি।

প্রেম বিষয়ক প্রবাদ:

মানব সৃষ্টি আদি থেকে প্রেম মানুষের সাথে অঙ্গাঅঙ্গি ভাবে জড়িত। প্রেম বিহীন মানুষের জীবন কল্পনা করা যায় না।

১. পিরিতি মজিলে মন,

কিবা হাড়ি কিবা ডোম।

চোর বিষয়ক প্রবাদ:

১.চোর যদি যায় স্নানে,

মন থাকে তার গাঁঠরি পানে।

বঙ্গাত্মক প্রবাদ :

১.দুই দিনের বৈরাগী

ভাতের কয় অন্ন।

বহুবিবাহ বিষয়ক প্রবাদ:

১.এক পক্ষের বউ আমার হেলাফেলা,

দুই পক্ষের বউ আমার তগলার মালা।

বিবাহ বিষয়ক প্রবাদ :

১. দেখে তো নিলাম মাকে আমরা ঘাটে,

মেয়েকে দেখতে আর কে অত হাঁটে?

২. বৃদ্ধ বাপ করতে গেলে বিয়ে,
পুত্র হাঁটে সামনে মশাল নিয়ে।

লোকবিশ্বাস ও সংস্কার

১. দোকান খুলে গঙ্গা জল ছিটিয়ে দিলে ব্যবসা ভালো হয়।

২. সন্ধ্যায় ধূপকাঠি জ্বালাতে হয়, তবে মঙ্গল হয়।

৩. লক্ষীপেঁচা বা হুতুম পেঁচা ডাকলে অমঙ্গল হয়।

৪. টাকার জন্য মানুষের বিশ্বাস পরিবর্তন হয়।

৫. ঘুমানোর সময় শিশুর মাথায় ফুঁ না দিলে শিশু বিছানায় পেশাব করবে।

ধাঁধা

ইট ঘুঘুর পিছটান, কোন ঘুঘুর চারকান ?

উত্তর -ঘরের চালা।

কাচাড় দিলে ভাঙ্গে না
টিপ দিলে সয় না।
বলো এটি কে?

উত্তর - ভাত

লাল গাভী বন খায়
জল খেয়ে মারা যায়।
সেটি কি?

উত্তর - আগুন

লাল বুড়ি হাটে যায়, চড় খাতি পরান যায়।

উত্তর- মাটির হাড়ি

কর্তাভজা সম্প্রদায়

কর্তাভজা আঠারো শতকে বৈষ্ণববাদ ও সুফিবাদ থেকে বিকশিত একটি ক্ষুদ্র ধর্মীয় সম্প্রদায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে আঠারো শতকের প্রথম ভাগে কর্তাভজা সম্প্রদায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এই সম্প্রদায়ের মূল গুরু আউলচাঁদ। গৃহী মানুষকে বৈরাগ্য ধর্ম শেখাতে শ্রীচৈতন্য আবির্ভূত হন আউলচাঁদ ফকির হয়ে। এখানে তাই কোনো জাতিভেদ নেই। আউলচাঁদ মুসলমান না হিন্দু ছিলেন তা স্পষ্টভাবে জানা যায় না। তাঁর আউল নাম থেকে মনে করা হয় তিনি মুসলমান ছিলেন, কারণ আউল "বাউল' মতবাদের একটি শাখা। তবে তিনি নিজের এ ব্যাপারে স্পষ্ট করে কিছু বলেন নি। তাঁর প্রথম জীবন সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না।

কর্তাভজা ধর্মের উৎপত্তি

কর্তাভজা আসলে ধর্ম নাকি মত নাকি বিশ্বাস তা নিয়ে যথেষ্ট যুক্তিতর্ক আছে। তবে অধিক পন্ডিত একে লোকধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে বেশি সাচ্ছন্দবোধ করেন।

প্রচলিত লোক কাহিনী অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা জেলার উলা গ্রামের পান ক্ষেত থেকে একটি নবজাতক শিশু পাওয়া যায়। ক্ষেতের মালিক মহাদের বারুই ভগবানের আশীর্বাদ ভেবে তাঁকে লালন-পালন করেন। বড় হয়ে তিনি গৃহত্যাগ করেন। আউল চাঁদের পুরানো নাম পূর্ণচন্দ্র। সংস্কৃত ভাষা শেখানোর জন্য তাঁকে পাঠানো হয় সে সময়কার বিখ্যাত বৈষ্ণবাচার্য হরিহরের কাছে। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণচন্দ্র নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ান এবং নানাভাবে শিক্ষালাভ করেন। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধিলাভ করেন, তাঁর নতুন নাম হয় ফকিরচাঁদ বা আউল চাঁদ। বহু দেশ ঘোরার পর নদীয়া জেলার ঘোষপাড়ায় রামশরণ পাল নামে এক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি তাঁকে আশ্রয় দেন। আউল চাঁদের ২২জন শিষ্যের মধ্যে অন্যতম শিষ্য রামশরণ পাল। ২২জনের মধ্যে রামশরণ পাল আউল চাঁদের মৃত্যর পর গুরুপদ প্রাপ্ত হন। যারজন্য তাঁর নেতৃত্বে পশ্চিম বঙ্গের নদীয়া জেলার ঘোষপাড়ায় প্রতিষ্ঠা করেন কর্তাভজা ধর্মের অন্যতম পীঠস্থান, যা পরবর্তী সময়ে সতী মায়ের মন্দির নামে সবার কাছে পরিচিত। রামশরণ পালের স্ত্রীর নাম সরস্বতী, যার নামেই এই মন্দির—-সতী মায়ের মন্দির। কথিত আছে, সরস্বতীর প্রথম অক্ষর 'স' আর শেষ অক্ষর 'তী' অনুসারে সতী। আউল চাঁদের শিষ্য রামশরণ পাল গুরুর ভাবাদর্শকে ভিত্তি করে কর্তাভজা সম্প্রদায় গড়ে তোলেন। এইজন্য ভক্তের নিকট তিনি 'কর্তা' এবং তাঁর স্ত্রী সরস্বতী দেবী 'কর্তামা' নামে অভিহিত। রামশরণ পালের পর সরস্বতী দেবী এই সম্প্রদায়কে নেতৃত্ব দেন। রামশরণ পালের স্ত্রী কর্তাভজা সম্প্রদায়কে দিশা দেখান। রামশরণের স্ত্রী সরস্বতী দেবী ছিলেন অতীব ধর্মপরায়ণা। শোনা যায়, আউল চাঁদ হিম সাগরের জল ও ডালিম তলার মাটির

সাহয্যে সরস্বতী দেবীকে অলৌকিক উপায়ে মৃত্য'র হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। আরও শোনা যায়, আউল চাঁদই রামশরণ পাল ও সরস্বতী দেবীর সন্তান হয়ে পরবর্তীতে জন্ম নেন দুলাল চাঁদ নামে। দুলাল চাঁদ (১৭৭৬-১৮৩৩) কর্তাভজা সম্প্রদায়কে সাংগঠনিক রূপ দেন। তিনি বহু পদ রচনা করে কর্তাভজা ধর্মমতকে একটা তাত্ত্বিক কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। পদগুলি ভাব-গীত-রূপে ভক্তদের নিকট সমাদৃত। কর্তাভজারা কোনো জাতিভেদ মানেন না। তাঁরা লোভ-মোহ-কাম-ক্রোধকে নৈতিক পাপ বলে মনে করেন। সত্ পথে থেকে এবং মিথ্যা কথা পরিহার করে নৈতিকভাবে ধর্মকর্ম করা তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। তাঁর সময়ে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের খ্যাতি বহুদূর পর্যন্ত গড়ায়। মাত্র ৪৮ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। এরপর তাঁর মা অর্থাত্ সরস্বতী দেবী কর্তা মা বা সতীমা নামে খ্যাতিলাভ করেন।

সতী মায়ের মন্দির

জীবিতকালে আউলচাঁদের জীবদ্দশায় তাঁর অসংখ্য ভাবশিষ্য তৈরি হয়েছিল। এঁদের ভিতরে উল্লেখ্য শিষ্য হিসেবে ২২জনকে বিবেচনা করা হয়। তাঁর মৃত্যুর পর, তাঁর প্রধান ৮ জন শিষ্য রামশরণ পালকে কর্তাভজা ধর্মের দ্বিতীয় কর্তবাবা পদে অভিষিক্ত করেন।

রামশরণ পাল কর্তভজা ধরমকে সাংগঠনিক রূপ দেওয়ার জন্য ঘোষপাড়ায় মেলার ব্যবস্থা করেন। প্রথমদিকে এই মেলা ততটা জমে না উঠলেও, ধীরে ধীরে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বিশেষ করে নিম্নবৃত্তের হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায় এই ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। রামশরণ পালের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী সরস্বতী এই ধর্মের প্রধানা হিসেবে দায়িত্বপালন করেন।

রামশরণের প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর, তিনি সরস্বতীকে বিয়ে করেন। পরবর্তীতে সরস্বতীর নাম সতীমা হয়। ধারণা করা হয় সরস্বতীর প্রথম ও শেষ অক্ষর থেকে নিয়ে সতী নামকররন করা হয়েছে। সতীমা'র মাধ্যমেই 'কর্তাভজা সত্যধর্ম' প্রচার ও প্রসার লাভ করেছিল তাই এই ধর্মীয় মতাদর্শ সতীমার মত নামেও বিশেষ পরিচিত। ঠাকুর আউলচাঁদ মহাপ্রভু সরস্বতী (সতীমা)কে (সতীমার স্বহস্তে রোপিত) একটি ডালিমগাছের তলে বসে জপ-তপ-ধ্যান-সাধন-ভজন করতে আজ্ঞা দিয়েছিলেন, সরস্বতী ঐ ডালিম তলায় বসে জপ-তপ-সাধন-ভজন করে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। কথিত আছে, সরস্বতী আউলচাঁদের মতো একটি সন্তান কামনা করেছিলেন। এছাড়া তিনি আউলচাঁদকে নিজের সন্তানের মতো স্নেহ করতেন, কিন্তু ভক্তি করতেন গুরুর মতো। তিনি আউলচাঁদের অলৌকিক শক্তি লাভ করেছিলেন। এই বিশ্বাস থেকে সরস্বতী শরণপালের মৃত্যুর পর কর্তাভজাদের পরিচালিকা

পদে অধিষ্ঠিতা হন। ভক্তরা তাঁকে দেবীর মতো মান্য করতেন। এই সূত্রে ঘোষপাড়ায় প্রতিষ্ঠিত মন্দিরটি 'সতী মায়ের মন্দির' হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। সরস্বতী ঠাকুরের মতো সন্তান লাভের যে আজ্ঞালাভ করেছিলেন, তা তিনি লাভ করেছিলেন ঠাকুরের মৃত্যুর প্রায় ৬ বছর পরে। তাঁর পুত্রের নাম রাখা হয়েছিল দুলালচাঁদ (রামদুলাল)।

বর্তমানে ঘোষপাড়ার দোলখেলা "সতীমায়ের মেলা' নামে পরিচিত। ভক্তরা ঘোষপাড়া অর্থে তাঁদের "মায়ের বাড়িতে' আসেন এবং তীর্থক্ষেত্রের সর্বাধিক পূন্যস্থান হিসেবে প্রধানত দুটি স্থানকে দর্শন, পুজার্পন করে থাকেন- এক, সতীমায়ের সমাধি মন্দির ও দুই, তাঁর সিদ্ধিলাভের স্থান-ডালিমতলা। এই দুই স্থানের কাছেই একটি পুকুর আছে। সেটিকে "হিমসাগর' বলে। এখানে স্নান গঙ্গাস্নানের মতোই পুন্যকর্ম।

কর্তাভজার মূল নীতি

কর্তাভজারা নিজেরদেরকে 'সত্য-ধর্ম'-এর অনুসারী হিসেবে দাবি করেন। এই কারণে সত্য কথা বলা তাঁদের ধর্মের মূলমন্ত্র। আবার এঁরা সত্যকে পরমাত্মার অপর নাম হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। এঁরা নিজেদের ভিতরে পরমাত্মার অস্তিত্ব অনুভব করেন। এদিক থেকে এঁদের মতবাদ দাঁড়ায় বাউল মতবাদের মতো। এঁরা বৌদ্ধ ধর্মের মতো বিশ্বাস করেন যে, পরমাত্মার সাথে জীবাত্মার মিলনে নির্বাণ লাভ হয়। এই নির্বাণের মধ্য দিয়ে তাঁরা নিজেদেরকে পরমাত্মা বা পরমস্রষ্টার অংশভাগী হয়ে যান। কখনো কখনো নিজেদের ভিতরে পরমস্রষ্টাকে অনুভব করেন। সুফিবাদের 'আনাল হক' তথ্য 'আমিই খোদা' মনে করেন। এঁরা শুক্রবারকে ধর্মপালনের দিন হিসেবে মনে করেন এবং পাঁচবার স্রষ্টার নাম জপ করেন। আচারের দিক থেকে এঁরা ইসলামি রীতি অনুসরণ করেন। সব মিলিয়ে এঁদের মত বৈষ্ণব, বৌদ্ধ এবং সুফি দর্শনের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়।

কর্তাভজা ধর্ম ছয়টি মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত যেমন- মিথ্যা থেকে বিরত থাকা, অন্যের স্ত্রীর অপহরণ না করা, চুরি না করা, মাদকাসক্ত না হওয়া ও অন্যের খাওয়ার পর অবশিষ্ট খাদ্যদ্রব্য না খাওয়া এবং অন্যের ব্যবহৃত জিনিস ব্যবহার না করা।

ছয়টি মূলনীতির পাশাপাশি লোকায়ত স্বাস্থ্য পরিচর্যা তাদের ধর্মের একটি অংশ। তাদের শাস্ত্রমতে কর্মফলই রোগব্যাধির মূল কারণ। ধর্মীয় অনুশাসন থেকে বিচ্যুতি ঘটলেই মানুষ রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হলে রোগীকে গলায় গামছা দিয়ে গুরুদেবের সামনে পাপ স্বীকার না করলে রোগী সুস্থ হয় না বলে তাদের বিশ্বাস। মানুষ মৃত্যুবরণ করলে মাটিচাপা দিয়ে সমাহিত করা হয়।

বিয়ে ও যৌনজীবন সম্পর্কিত কিছু নিয়মনীতি

ভগবানিয়া পুরুষদের বিয়ে হয় কনের বাড়িতে। কনেকে লাল শাড়ি আর বরকে সাদা ধুতি পরতে হয়। গুরুদেবের উপস্থিতিতে বর কনেকে মাথায় সিঁদুর পরিয়ে দেয় এবং গুরুদেবের কিছু উপদেশের মাধ্যমে বিবাহকার্য সম্পন্ন হয়। এরপর বর কনেকে সম্পত্তি হিসেবে এক টাকা দিয়ে থাকে। কোনো পুরুষ কোনো বিধবাকে বিয়ে করতে পারে না আর করলে তাকে সমাজচ্যুত হতে হয়।

কর্তাভজা সম্প্রদায়ের যৌনজীবন খুবই সুশৃঙ্খল। সন্তান নেওয়ার উদ্দেশ্যে এমনকি সাধারণভাবেও অমাবস্যার ১৫ দিন স্বামী-স্ত্রীর যৌনমিলন সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। তা ছাড়া, শুক্রবার, শনিবার, মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার যৌন মিলন গ্রহণযোগ্য নয় বলে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের অনুসারীরা মনে করে। ভরাপেটে দিনের বেলা, সংকীর্ণ জায়গায় অথবা স্বল্প আলোয় (ডিম লাইটে) যৌনমিলন সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। মহিলাদের গর্ভবতী হওয়ার প্রথম তিন মাস ও সন্তান প্রসবের পরবর্তী তিন মাস যৌনমিলন সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কিত কিছু নিয়মনীতি

মাংস খাওয়া তাদের ধর্মমত অনুসারে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সে কারণে মাংস খাওয়া তো দূরের কথা, প্রাণীর শরীরের উপাদান থেকে তৈরি জিনিসপত্র যেমন-চামড়ার জুতা, বেল্ট ও ব্যাগ পর্যন্ত তারা ব্যবহার করেন না। তাদের ধারণা, চামড়ার জিনিস ব্যবহার করলে তারা রোগে আক্রান্ত হতে পারেন।

এই ধর্মমত অনুসারে মাংস ছাড়াও শোল মাছ, বোয়াল মাছ, গজার মাছ ও মসুরির ডাল খাওয়া নিষিদ্ধ। একসময় তারা পেঁয়াজ, রসুন খেত না। কিন্তু বর্তমানে গুরুদেবদের সম্মতিক্রমে পেঁয়াজ, রসুন খেয়ে থাকে। অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দিন তারা নিরামিষ খাবার খেয়ে থাকে এবং এই সময় তাদের খাবার হচ্ছে রুটি ও ফল। তারা কখনো জুতা পায়ে রান্নাঘরে প্রবেশ ও খাবার পরিবেশন করে না। গুরুদেবদের না খাওয়ায়ে তারা কোনো ঋতুভিত্তিক ফল খায় না। বিধবাদের আমিষযুক্ত খাবার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কেউ মারা গেলে পরিবারের লোকেরা তিন দিন মাছ খায় না।

কর্তাভজারা অসুস্থ হওয়ার ভয়েঅন্য সম্প্রদায়ের লোকদের বাড়িতে কোনো খাবার খায় না। তাদের পরিবারের প্রত্যেক সদস্যদের জন্য পৃথক থালা, বাটি, গ্লাস ও ব্যবহার্য জিনিসপত্র থাকে। যদি কোনো অনুষ্ঠানে ৫০০ লোক উপস্থিত থাকে তাহলে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য।

মৃত্যু পরবর্তী সংস্কার

কর্তাভজা সম্প্রদায়ের কেউ মারা গেলে শুধু স্বজনরাই মৃত ব্যক্তিকে পরিচ্ছন্নভাবে ধৌত করাতে পারে। সুন্দরভাবে মৃত ব্যক্তিকে ধৌত করার পর মাটিচাপা দেওয়া হয়। শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে কোনো নারীর অংশগ্রহণ থাকে না।

ধর্ম অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের প্রথম দিন চুল ছাঁটানো, শেভ হওয়া, মাথায় তেল ব্যবহার ও আমিষ খাওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। চতুর্থ দিনে চুল ছেঁটে বা শেভ হয়ে গোসল করে পরিচ্ছন্ন হতে হয়। ঐ দিন মাটি দিয়ে ঘর এবং গোবর দিয়ে উঠান লেপন করা হয়। পাশাপাশি ঐ দিন ঘরের সমস্ত কাপড়চোপড় ও বিছানাপত্র সাবান বা সোডা দিয়ে ধুয়ে ফেলা হয় এবং মৃত ব্যক্তির ব্যবহৃত জিনিসপত্রগুলো ফেলে দেওয়া হয়।

চিকিৎসাপদ্ধতি

কর্তাভজা ধর্মের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো লোকায়ত স্বাস্থ্য পরিচর্যার পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ। রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে প্রকৃতির বিভিন্ন গাছ-গাছড়া ও উপাদান এবং নিয়মনীতির ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

কর্তাভজা সম্প্রদায়ে লোকচিকিৎসা :

- শরীরের কোনো অংশ কেটে গেলে লংকাবেড়ির বা গাঁদা ফুলের পাতা পিষে লাগালে রক্তপড়া বন্ধ হয়ে যায়।
- পাতলা পায়খানা হলে ভাতের মাড় বা চিড়া ভিজিয়ে লেবুর পাতা চটকিয়ে রোগীকে খাওয়াতে হয়।
- অসহ্য পেটের ব্যথায় কিছু সরিষা, আতপ চাল ও লবণ একসঙ্গে চিবিয়ে পানি খেলে ব্যথা সেরে যায়।
- পাথরকুচির পাতা লবণ দিয়ে বেটে পেটের চারপাশে প্রলেপ দিলে পেট ব্যথা ভালো হয়ে যায়।
- বরই গাছের পাতা ও সজনের ফুল বেটে বড়ি তৈরি করে নিয়মিত খেলে গ্যাস্টিক থেকে আরোগ্য লাভ করা যায়।
- আখের চিনির সঙ্গে কুমুরকি লতার ডগা ৩-৪টি পরপর কয়েক দিন খালিপেটে খেলে ঘন প্রসাব ভালো হয়।
- মাথা যন্ত্রণায় তেলাকচুর পাতা বেটে রস করে খেতে হয়।
- স্মরণশক্তি কমে গেলে তা বাড়াতে কুমুরকির লতার ডগা খালি পেটে কয়েক দিন খেলে স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়।

প্রচলিত কোনো ধর্মীয় বিধান কর্তাভজা ধর্মে তাদেরকে বেশকিছু নিয়ম পালন করে চলতে হয়। বলা যেতে পারে কর্তাভজাদের জীবন ধর্মে বাঁধা নয় বরং নিয়মে বাধা। **তাদের করণীয় নিয়মগুলো হলো :**

- পিরিয়ডের সময় মহিলাদের গোয়ালঘরে যাওয়া, ধানের গোলা ও সন্ধ্যা প্রদীপ স্পর্শ, বৃক্ষরোপণ ও রান্না করা নিষিদ্ধ।
- পিরিয়ডের সময় শিশুদের বুকের দুধ খাওয়ানো ও স্পর্শ করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।
- যে নারী শিশু জন্মের পর নাভির নাড়ি কেটে ফেলে তাকে অন্য চোখে দেখা হয়, এমনকি তার হাতে রান্না করা খাবার পর্যন্ত কেউ খায় না।
- এই সম্প্রদায়ের লোকেরা উত্তর দিক সম্মুখ (রাজপুতা) করে ঘর তৈরি করে, যাতে সহজে আলো বাতাস চলাচল করে।
- সন্তান বড় হলে মূল ঘরের পাশে বারান্দা তৈরি করে আলাদাভাবে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। আর্থিকভাবে সেটা সম্ভব না হলে মূল ঘরের ভেতর পৃথক শয্যার ব্যবস্থা করা হয়।

সতীমায়ের মন্দির কেন্দ্রিক বিশ্বাস ও সংস্কার

বর্তমানে সতীমা মন্দিরকেন্দ্রিক নানান প্রথা এবং আচার- বিশ্বাস প্রচলিত আছে। সেগুলোর মধ্যে মানত অন্যতম। মন্দিরের সামনের দীঘি যেটা হিমসাগর নামে পরিচিত, সেখানে গোসল করে দন্ডি কেটে মাটির বা কাঠের ঘোড়া, হাতি, খরগোশ বা মোরগ সুতা দিয়ে মন্দির প্রাঙ্গনের ডালিম গাছে বেঁধে দিয়ে মানত করতে হয়। মানত পূরণ হলে এসে বেঁধে দেয়া মূর্তি খুলে ফেলতে হয়।

জনশ্রুতি আছে, পূর্বে বধির, অন্ধ বা অন্যান্য অসুস্থতার জন্য মানত করলে আরোগ্য লাভ করা যেত। এখনও অনেকে মানত করলেও আধুনিকতার স্পর্শে অনেকেই এসব আর বিশ্বাস করতে চায় না। যেমন : মন্দির এলাকার স্বপন (বয়স ৬৩, পেশায় দিনমজুর। দুই ছেলে, এক মেয়ে) বেশ কয়েকবার মানত করেও ফল না পাওয়ায় এখন আর বিশ্বাস করেন না।

এছাড়াও জনশ্রুতি আছে, হিমসাগরে প্রতিবছর দুইতিনজন মারা যায়। যদিও অনেকেই বিষয়টা অলৌকিক বলতে নারাজ। মূলত মেলায় অনেক মানুষ হওয়ায় পূর্বে হয়ত কোনোকালে কেউ ডুবে মারা গেছিলো, সেখান থেকেই কুসংস্কারটি চালু হয়ে গেছে বলে মন্দিরএলাকার অধিকাংশ বাসিন্দা মন্তব্য করেন।

ক্ষেত্র সমীক্ষা চলাকালীন একজন পাওয়া যায়, যে পূর্বে বধির থাকলেও পরবর্তীতে সতীমাতার মন্দিরে মানত করে আরোগ্য লাভ করে। **উক্ত ব্যক্তির পরিচয় নিম্নে দেয়া হলো :**

নাম : রতন সরকার

বয়স : ২৯ বছর

পেশা : আলমারি মেকার

বিবাহিত জীবন : অবিবাহিত

মোবাইল নাম্বার : ৯৬৭৪০১৮৫৬৭

ঠিকানা : কল্যাণী ঘোষপাড়া, নদীয়া।

রতন সরকার জন্ম থেকে বধির ছিল। ৭ বছর বয়সে তার বাবা-মা, বোন সতীমায়ের মন্দিরে বধির ভালো হওয়ার মানত করে। ফলশ্রুতিতে রতন সরকার ৭ বছর বয়সে কথা বলা শুরু করে। এখন অবধি কোনো সমস্যা ছাড়া তিনি কথা বলতে পারেন। তবে তিনি খুব কম কথা বলেন।
তার বাবা-মা মারা যাওয়ায় তিনি এখন তার একমাত্র বোনের সাথে থাকেন। এতোদিনেও কেন ভাইয়ের বিয়ে দেয়া হয়নি জানতে চাইলে তার বোন কোনো উত্তর দিতে পারেন নি।

রতন সরকারের বোনের পরিচয় :

নাম : আশা রায়

বয়স : ৩১

স্বামী : শ্রী বিশ্বজিৎ রায় (৩৭)

সন্তান : এক ছেলে

মোবাইল : ৮১০০৫৩১৯০৮

ঠিকানা : কল্যাণী ঘোষপাড়া, নদীয়া।

কলকাতা

কলকাতা হল পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী। পূর্ব ভারতের বৃহত্তম শহর কলকাতা ভারতের বৃহত্তম মহানগরীয় অঞ্চলগুলিরও অন্যতম। বাংলার নবজাগরণের আঁতুরঘর কলকাতা সুদীর্ঘকাল ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসেবে পরিচিত। ভারতের বহু কবি, সাহিত্যিক, নাট্যব্যক্তিত্ব, সংগীতজ্ঞ, সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, সাংবাদিক, চলচ্চিত্র পরিচালক এবং নোবেল পুরস্কার বিজয়ী এই শহরে জন্মগ্রহণ করেন অথবা এখানেই নিজেদের কর্মজীবন অতিবাহিত করেন। তাই কেউ কেউ মনে করেন ভারতের যে শহরগুলি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে বেশি প্রগতিশীল, সেগুলির অন্যতম এই কলকাতা।

কলকাতার আয়তন ১,৮২৬,৬৭ কিমি। ২০০৬ সালের হিসেব অনুযায়ী, মোট ৭২ টি বড় শহর এবং ৫২৭ টি ছোটো শহর ও গ্রাম এই এলাকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিভিন্ন স্থানের মধ্যে দূরত্ব অনুযায়ী কলকাতাকে ৪ টি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও মধ্য কলকাতা।

ইতিহাস

১৬০৮ সালে বড়িষার সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের পূর্বপুরুষ লক্ষ্মীকান্ত রায়চৌধুরী কলকাতার জমিদারীর স্বত্ব পান। তারপরে ১৬০৯ সালের ২৮শে আগস্ট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মাধ্যক্ষ জব চার্নক তার কাছ থেকে সুতানুটি, গোবিন্দপুর, কলিকাতা নামে এই তিনটি গ্রাম নিয়ে কলকাতার গোড়াপত্তন করেন। তবে হাইকোর্টের রায়ে মিলেছে যে জব চার্ণক কলকাতার জনক নন। ১৩০০ টাকায় সাবর্ন রায়চৌধুরীরা কলকাতার স্বত্ব দেন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে। ১৭১৭ সালে আরও ৩৮ কাটা জমি কিনে সাম্রাজ্যের বনিয়াদ গড়ে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী অর্থ্যাৎ ব্রিটিশ। ১৭৪২ সালে কলকাতাকে মারাঠা আক্রমন থেকে রক্ষা করতে মারাটা ডিচ্ খনন করেন ব্রিটিশরা যেটা আজকের খালপাড়। ১৭৫৭ সালে নবাবের সঙ্গে শান্তি চুক্তিতে নতুন করে দখল পায় ব্রিটিশরা আর ঐ বছরই সিরাজকে হটিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত প্রস্তুত করেন লর্ড ক্লাইভ এই কলকাতায়। বাংলার, মন্বত্বরে এই কলকাতায় বেশ কয়েক হাজার লোকের মৃত্যু হয়। প্রথম গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস ভারতে ব্রিটিশ রাজের রাজধানী গড়েন এই কলকাতায়। মুর্শিদাবাদ থেকে রাজ্যপাট তুলে ১৭৯৩ সালে দক্ষিণ ছেড়ে কলকাতায় আসে ব্রিটিশ। বাবু কালচারে মেতে ওঠে কলকাতা। কলকাতা সর্বজনীন শহর। সকল জাতি, সকল ধর্ম, সকল ভাষাভাষির স্থান এই কলকাতায়।

সীমানা

উত্তরে-সিঁথি, কাশীপুর ও ঘুঘুডাঙ্গা। দক্ষিণে-টালিগঞ্জ, খিদিরপুর ও বেহালা। পূর্বে-সল্টলেক, বেলেঘাটা, তপসিয়া আর পশ্চিমে-হুগলী নদী।

জলবায়ু

কলকাতার তিনটি প্রধান ঋতু রয়েছে: গ্রীষ্ম, মৌসুমি, এবং শীতকাল। মার্চ থেকে মে গরম এবং আর্দ্র গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা ৩৮-৪২ ° সেলসিয়াস স্পর্শ করে। বর্ষা জুনে শুরু হয় এবং সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এই সময় ভারী বৃষ্টি কখনো কখনো কয়েকটি এলাকায় জলাবদ্ধতার কারণ হতে পারে। শীতকাল নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি। আবহাওয়াটি ৮ থেকে ২০ ডিগ্রী পর্যন্ত তাপমাত্রার সাথে খুব মনোরম।

ভাষা ও ধর্ম

কলকাতায় মুলত সংখ্যাগরিষ্ঠ হল বাঙালিরা। এছাড়াও মারোয়াড়ী, বিহারি, মুসলিম, জৈন প্রমুখ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ও বাস করে। এছাড়াও চিনা, তামিল, নেপালি, ওড়িয়া, তিব্বতি, পাঞ্জাবী, প্রভৃতি জাতির মানুষও বাস করে। তাই কলকাতার মূল ভাষা হল বাংলা ও ইংরেজি। এছাড়াও হিন্দি, উর্দু, ওড়িয়া ভাষাও শহরের এক অংশের দ্বারা কথিত হয়ে থাকে।

কলকাতায় যেহেতু হিন্দুর সংখ্যা বেশী তাই মূলধর্ম হল হিন্দু ধর্ম। এছাড়াও মুসলিম, খ্রীস্টান, জৈন আছে এবং আছে শিখ, বৌদ্ধ ইহুদী সম্প্রদায়।

দর্শনীয় ও ঐতিহাসিক স্থান

ময়দান : ময়দান কলকাতা জেলার একটি এলাকা। কলকাতা শহরের কেন্দ্রস্থলে, ৪০০-হেক্টর জুড়ে বিস্তৃত সবুজ এলাকা এটি। ময়দান পশ্চিমে হুগলি নদী থেকে পূর্ব দিকে চৌরঙ্গী এবং পার্ক স্ট্রিট পর্যন্ত বিস্তৃত এবং দক্ষিণে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল থেকে উত্তরে রাজভবন এবং ইডেন গার্ডেন পর্যন্ত বিস্তৃত।

জাদুঘর : কলকাতার ভারতীয় সংগ্রহালয় হল এশিয়ার সবচেয়ে পুরনো জাদুঘর। ১৮১৪ সালে এই জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে ভারতের প্রাকৃতিক ইতিহাস ও ভারতীয় শিল্পকলার এক বিরাট সংগ্রহ সংরক্ষিত আছে।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল : এটি ১৯২১ সালে যুক্তরাজ্যের সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতিসৌধ হিসেবে স্থাপিত হয়েছিল। সৌধটি বেলফাস্ট সিটি হলের আদলে নির্মিত। এর মধ্যে ইতালীয় রেনেসাঁ, ইন্দো-সারাসেনীয় ও মুঘল স্থাপত্যশৈলীর সংমিশ্রণ দেখা যায়। বর্তমানে এটি একটি জাদুঘর ও প্রদর্শশালা।

এসপ্ল্যানেড : পুরনো কলকাতার এই ঔপনিবেশিক শাসনকেন্দ্রটি আজও কলকাতার কেন্দ্রীয় বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক অঞ্চল। এই এলাকাটিকেই অনেকে কলকাতার প্রাণকেন্দ্র মনে করেন। এসপ্ল্যানেড, চৌরঙ্গির উত্তর দিকের কিছুটা এলাকা, মাদার টেরিজা সরণি (পার্ক স্ট্রিট), মির্জা গালিব স্ট্রিট (ফ্রি স্কুল স্ট্রিট), বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (ডালহৌসি স্কোয়ার), চাঁদনি চক, বড়োবাজার ও সদর স্ট্রিট নিয়ে এই অঞ্চলটি গঠিত।

হাওড়া ব্রিজ : রবীন্দ্র সেতু (পূর্বনাম হাওড়া ব্রিজ) হুগলি নদীর উপর অবস্থিত কলকাতা ও হাওড়া শহরের মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী সেতুগুলির মধ্যে অন্যতম। ১৮৭৪ সালে প্রথম হাওড়া সেতু নির্মিত হয়। পরে ১৯৪৫ সালে পুরনো সেতুটির বদলে বর্তমান বহির্বাহু সেতুটির উদ্বোধন হয়।

কফি হাউস : ঐতিহ্যবাহী ও বাঙালির আড্ডাস্থল কফি হাউস কলকাতার কফিহাউস সমূহের মধ্যে প্রাচীনতম। এটি ইন্ডিয়ান কফি হাউসের একটি স্থানীয় শাখা। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্টোপাশে অবস্থিত কফি হাউসটি কলকাতার সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে এবং এটি বুদ্ধিজীবিদের আড্ডাস্থল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

ইডেন গার্ডেন্স : ইডেন গার্ডেন্স ভারতের একটি প্রাচীনতম ক্রিকেট স্টেডিয়াম। ১৮৬৪ সালে এ স্থাপনাটি নির্মাণ করা হয়েছিল।

উপসংহার

আলোচ্য গবেষণা পত্রের শিরোনাম ' ভারতের পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি সমীক্ষা' হলেও এখানে কর্তাভজা সম্প্রদায় এবং কলকাতার বিভিন্ন দর্শনীয় ও ঐতিহাসিক স্থানের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, শিরোনামের সাথে সামঞ্জস্য পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি বলতে পুরো পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে গবেষণা করা হয়নি। বরং শুধু নদীয়া জেলার কল্যাণী ঘোষপাড়ার ২ ও ৩ নাম্বার ওয়ার্ডে বসবাসরত বাসিন্দাদের উপর গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

আধুনিকতার স্পর্শ সব স্থানেই লেগে গেছে। তেমনি গবেষণা স্থানেও আধুনিকতার স্পর্শে লোকসংস্কৃতি এবং লোক ঐতিহ্য অনেকাংশে লোপ পেয়েছে। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের একসময় অনেক চমকপ্রদ ইতিহাস থাকলেও বর্তমানে তাদের অবস্থা অনেকটা মৃতপ্রায়। এমনকি পূর্বে যেখানে ৩০ দিন মেলা হত, সেখানে বর্তমানে ১৫ দিন মেলা হয়।

তবে আধুনিকতার স্পর্শ থাকলেও কিছু লোকসংস্কৃতি এখনো গবেষণা এলাকায় বিরাজমান। বিশেষ করে ধাঁধা, প্রবাদ, লোকবিশ্বাস এবং কীর্তন এখনো জীবন্ত আছে কল্যাণী ঘোষপাড়ায়। উক্ত এলাকায় বেশকিছু লোকসংস্কৃতি আছে যেগুলো নানান সীমাবদ্ধতায় সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। লোকসংস্কৃতির উন্নয়নকল্পে গবেষণা এলাকায় আরো ব্যাপক গবেষণা কর্ম চালানো উচিত বলে আমি মনে করি।